এফসিটিসি অনুচ্ছেদ ৫.৩ বাস্তবায়নে অবহেলার মাসুল দিচ্ছে তরুণ সমাজ

লেখকঃ কাজী মোহাম্মাদ হাসিবুল হক, প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট লিড, ডেভলপমেন্ট একটিভিটিস অফ সোসাইটি (ডাস)
মোবাইলঃ ০১৭১০০২৪৬২৬, ইমেইলঃ hasibuldastcp@gmail.com

টোব্যাকো অ্যাটলাস ২০২৫ অনুযায়ী, তামাক ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশে বছরে প্রায় ২ লক্ষ মানুষের অকাল মৃত্যু হয়। কিন্তু এই বিপুল প্রাণহানির পেছনে কেবল তামাকের ক্ষতিকর উপাদানই দায়ী নয়; সমানভাবে দায়ী তামাক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সূক্ষ্ম ও কৌশলগত অপতৎপরতা। জনস্বাস্থ্য নীতি নির্ধারণে তামাক শিল্পের অপ্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ রুখে দিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল' (FCTC)-এর অনুচ্ছেদ ৫.৩ (Article 5.3) একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক হাতিয়ার। অথচ বাংলাদেশে এই অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নে কার্যকর আইনি পদক্ষেপের অভাব এবং সরকারি আমলাতন্ত্রের সঙ্গে তামাক কোম্পানির ঘনিষ্ঠতা পুরো দেশকে এক গভীর স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

ডাব্লিউএইচও এর সার্বজনীন তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এই আন্তর্জাতিক চুক্তির (FCTC) ৫.৩ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- জনস্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই তামাক শিল্পের বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে। নীতিগতভাবে জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্য এবং তামাক শিল্পের মুনাফার লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। একটি তামাক কোম্পানি যখন তাদের ব্যবসার প্রসার চায়, তখন তারা মূলত ধূমপায়ীর সংখ্যা বাড়াতে চায়। আর সরকার যখন জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা দিতে চায়, তখন তামাকের ব্যবহার শূন্যে নামিয়ে আনাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই মৌলিক নীতিগত বিরোধের কারণেই নীতি নির্ধারণে তামাক শিল্পের অংশগ্রহণকে আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশ্বের যেসব দেশ তামাক নিয়ন্ত্রণে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে, তারা সকলেই অনুচ্ছেদ ৫.৩ কঠোরভাবে মেনে চলেছে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং উরুগুয়ে তামাক কোম্পানির কোনো প্রকার 'কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি' (CSR) বা তথাকথিত সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। এমনকি সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কঠোর নির্দেশিকা (Code of Conduct) ও তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হয়েছে। গ্লোবাল টোব্যাকো ইনডেক্স (Global Tobacco Index)-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যেসব দেশ ৫.৩ অনুচ্ছেদ মেনে সরকারি নীতিকে সুরক্ষিত রেখেছে, সেখানে তামাকের প্রাক্কলিত ব্যবহারের হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে এবং তরুণদের ধূমপানে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রবণতা কমে এসেছে।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় চিত্রটি ঠিক উল্টো এবং উদ্বেগজনক। সাউথ এশিয়ান আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে তামাক শিল্পের হস্তক্ষেপের মাত্রা অত্যন্ত বেশি। স্টপ (STOP) প্রজেক্ট ও কারিগর গবেষণা সংস্থাগুলোর পরিচালিত 'গ্লোবাল টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারফেরেন্স ইনডেক্স'-এ নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিকে উঠে এসেছে। বাংলাদেশে বিএটিবি (BATB)-সহ প্রধান তামাক কোম্পানিগুলোতে সরকারের শেয়ার থাকার অজুহাতে সরকারি উচ্চপদস্থ আমলারা এসব কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে বসে থাকেন। ফলে যখনই সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনের উদ্যোগ নেয়, কিংবা কর কাঠামোর মাধ্যমে তামাকের দাম বাড়াতে চায়, তখনই তামাক কোম্পানির খাতটির পক্ষ থেকে মারাত্মক নীতিগত বাধা তৈরি করা হয়।

সবচেয়ে ভয়াবহ বাস্তবতা হলো, এই কোম্পানি হস্তক্ষেপ সরাসরি ক্ষতি করছে বাংলাদেশের তরুণদের। বাংলাদেশে ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার ৬.৯%, যা গ্লোবাল ইয়ুথ টোব্যাকো সার্ভে (GYTS) অনুযায়ী একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নির্দেশ করে। তরুণদের তামাক ও ই-সিগারেট বা ভ্যাপিংয়ে আসক্ত করতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো আকর্ষণীয় কৌশল গ্রহণ করছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে রঙিন ডিসপ্লে সাজিয়ে সিগারেট বিক্রি, ই-সিগারেটকে 'কম ক্ষতিকর' বা 'ফ্যাশনেবল' হিসেবে প্রচার করা এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির নামে কালচারাল/কনসার্ট অনুষ্ঠান আয়োজন করে তরুণদের কাছে পৌঁছানোর অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের খসড়ায় যখনই সব ধরনের খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধ করা, তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় লাইসেন্স কার্যকর

করা এবং ই-সিগারেট সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব আনা হয়, তখনই তামাক কোম্পানিগুলো কর্মসংস্থান ও রাজস্ব হারানোর ভিত্তিহীন ভয় দেখিয়ে সরকারের অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়। সরকারি নীতিনির্ধারকদের সাথে যৌথ সভা বা সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে উপহার হস্তান্তরের ঘটনাগুলো অনুচ্ছেদ ৫.৩-এর স্পষ্ট লঙ্ঘন।

আইন ও নীতিগত পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ২০০৩ সালে FCTC-তে স্বাক্ষর করলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যখন জনস্বাস্থ্য রক্ষায় আইন কঠোর করতে চায়, অন্য কয়েকটি মন্ত্রণালয় তামাক কোম্পানির বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় উল্টো অবস্থান নেয়। এই প্রাতিষ্ঠানিক বৈপরিত্য তামাক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকে একদম দুর্বল করে দিচ্ছে।

যদি এখনই এফসিটিসি অনুচ্ছেদ ৫.৩-এর আলোকে কঠোর আইন প্রণয়ন না করা হয়, তবে এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি হবে ভয়াবহ। তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় প্রতি বছর বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের ওপর যে বিপুল আর্থিক চাপ তৈরি হয়, তা তামাক খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের চেয়ে দিগুণেরও বেশি। এছাড়া তরুণ প্রজন্ম যদি বিপুল সংখ্যায় অসংক্রামক ব্যাধিতে পঙ্গুত্ব বরণ করে বা অকালে প্রাণ হারায়, তবে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক লভ্যাংশ অর্জনে ব্যর্থ হবে।

এখন নীতিনির্ধারকদের সামনে দুটি পরিষ্কার পথ খোলা রয়েছে, হয় বহুজাতিক তামাক কোম্পানির ক্ষতিকর কর্পোরেট স্বার্থ সুরক্ষা দেওয়া, না হয় কোটি কোটি নাগরিকের জনস্বাস্থ্য ও তরুণদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করা। এ বিষয়ে অবিলম্বে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

কিছু কাজ দ্রুত করা প্রয়োজন যেমনঃ

- এফসিটিসি অনুচ্ছেদ ৫.৩ সংক্রান্ত নির্দেশিকা অতিদ্রুত মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদন করে সব সরকারি কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়ের জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- সরকারি কর্মকর্তাদের তামাক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে থাকা এবং শেয়ার ধারণ নীতি থেকে সরকারকে স্থায়ীভাবে বেরিয়ে আসতে হবে।
- তামাক কোম্পানির সমস্ত প্রচ্ছন্ন সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচি ও পুরস্কার বিতরণ বন্ধ করতে হবে, যা মূলত তাদের ব্র্যান্ডিংয়ের কৌশল।
- ই-সিগারেট নিষিদ্ধকরণে আইন দ্রুত তৈরি করতে হবে।

জনস্বাস্থ্য কোনো দরকষাকষির বিষয় নয়। রাজস্ব ও বাণিজ্যের দোহাই দিয়ে তামাক কোম্পানিকে সরকারি নীতির ওপর ছড়ি ঘোরাতে দেওয়া রাষ্ট্রীয় দায়িত্বহীনতার শামিল। তরুণ সমাজকে তামাকের করাল গ্রাস থেকে বাঁচাতে এবং বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্য অর্জনে এফসিটিসি অনুচ্ছেদ ৫.৩-এর পূর্ণ বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।